যুগান্তর

তারিখ ... 22 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ...

আলহাজ জহিরুল হক

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাও শহীদ মিনারে যায়

'সভ্যতার মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি
শিশুর জন্ম থেকে জরাদেহ ক্ষীণশ্বাস মানবের অবলুপ্তির সীমারেখায়
বলে গেল সেই কথা। সেই কথা বলে গেল অনর্গল' (সৈয়দ শামসুল হক)

বিগত ৪৭ বছর ধরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে শুরু করে দুপুর ১২টা পর্যন্ত নানারকম বাধা-বিপত্তি আর প্রতিকূল আবহাওয়া অতিক্রম করে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন করেছি। যতদিন বেঁচে থাকব বাংলা ভাষার অমোঘ টানে হোক, মনের আবেগে হোক, স্বাধীনতার মন্ত্রে হোক অথবা জয় বাংলা শ্লোগানে হোক— ফুলে-ফুলে, গান-গানে প্রাণের শহীদ মিনারে উপস্থিত ছিলাম, থাকব। আমার ৪ বছরের নাতি গান গেয়ে শোনায়, 'ঢাকায় রাজধানী হয়েছে, ভাইয়েরা রক্ত দিয়েছে বলে। যাপিত যে সুন্দর জীবন আমাদের আজ, তাও সেই ৫২ শহীদ ভাইদের জন্য'। আমি শুনেছি, ওদের কিন্ডারগার্টেন স্কুলেও বাংলা ভাষা শেখানো হয়। অথচ স্বাধীনতার ৩৬ বছরেও কোন মাদ্রাসায় এ শিক্ষা দেয়া হয়নি। আমার পেশাগত জীবনে বহু মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, ওরা লুকিয়ে, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে শহীদ মিনারে আসে শ্রদ্ধা জানাতে। বিগত কয়েক বছর ধরে শহীদ বেদিতে এ ধরনের শিক্ষার্থীকে আমি দেখছি।

প্রতি বছর শহীদ মিনারের প্রভাতফেরিতে কয়েকটি উজ্জ্বল মুখ দেখে মনটা আনন্দে ভরে ওঠত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত চরমপত্রের শ্রদ্ধেয় মুকুল ভাই (এমআর আখতার মুকুল), তার স্ত্রী রেবা ভাবীকে দেখেছি তাদের সন্তান সাগরকে নিয়ে শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করতে। আরও দেখেছি শ্রদ্ধেয় ডক্টর আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ওয়াহিদুল হক, সনজীদা ভাবী, স্বর্গীয় সঙ্গীত পরিচালক সমর দাস, জগদ্বিখ্যাত সাঁতারু ব্রজেন দাস, সদ্য প্রয়াত চিত্রশিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, কবি ও সাংবাদিক ফয়েজ আহম্মেদ, সাংবাদিক কামাল লোহানী, কবি নির্মলেন্দু গুণ, নাট্যকার রামেন্দু মজুমদার এবং অভিনয় শিল্পী ফেরদৌসী মজুমদার, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, চিত্রনায়িকা কবরী সারোয়ার, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, শওকত আলী— এরকম বহু মানুষ, কেউ একা, কেউ পরিবার-পরিজন নিয়ে আসেন পবিত্র শহীদ মিনারে। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা এবং শহীদ আলতাফ মাহমুদের সুর করা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...' গানটি গাইতে গাইতে সবাই শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের লাইনে দাঁড়ান। জাতীয় প্রেস ক্লাব, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নও রাত ১২টার পর শ্রদ্ধা জানায়। পলাশী, ওয়ারী, নারিন্দা, রহমতগঞ্জ এলাকাগুলো থেকে ঢাকা শহরের বিশেষ কিছু পরিষদ শ্রদ্ধা জানাত, এখনও জানায়। বিশেষভাবে ফুলের তৈরি শহীদ মিনার নিয়ে তারা আসত। হয়তো ৪৭ বছরের মানুষ আর নাই, কিন্তু সেই ঐতিহ্যের নির্যাস আজও জীবন্ত। স্বাধীনতার আগে-পরে বহু নাম না জানা নারীকে দেখেছি খালি পায়ে ফুলের তোড়া হাতে শ্রদ্ধা জানাতে। প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল, ইডেন কলেজ ছাত্রীনিবাস থেকে ছাত্রীরা আসে শহীদ মিনারে। কালো পাড়ের সাদা শাড়ি পরে গানে আর ফুলে জানিয়ে যায় অমর ভাষা শহীদদের প্রতি তাদের অসীম শ্রদ্ধা।

স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানানো বর্তমান সময়ের মতো এতটা সহজ ছিল না; তখন পাকিস্তান সরকার শহীদ মিনারে বাঙালির পদচারণা বন্ধ করতে ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু তারপরও দেখেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা চারজন করে ছেঁটে গেছে শহীদ মিনারে, তাদের প্রাণের মন্দিরের মহার্ঘ্য নিবেদন করেছে শহীদ বেদিতে। এ সাহসিকতা কেবল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; শিক্ষক, কবি, লেখক, রাজনীতিবিদ, শ্রমিক, সাংবাদিকসহ সর্বস্তরের মানুষের চারজন করে শ্রদ্ধা জানানোর যে দৃশ্য, তা আজও আমার চোখে ভাসে, সেই ছবি এখনও রয়েছে আমার কাছে। পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছিল ঠিকই, কিন্তু বন্ধ করতে পারেনি বাঙালির শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মিছিলকে। পাকিস্তানিরা আমাদের পবিত্র শহীদ মিনারকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আবার দাঁড়িয়েছে শহীদ মিনার, যা বাঙালির সব কিছুর আশ্রয়স্থল। এ শহীদ মিনারের সঙ্গে সমগ্র বাঙালির প্রাণের আবেগ জড়িত। তাই তো আজ স্বাধীনতার ৩৬ বছর পরও যখন দেখি এ শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে একশ্রেণীর বাঙালি জুতা পায়ে বাড়াবাড়ি চোখে পড়ে। আমি অবশ্যই ইংরেজির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু মাতৃভাষাকে ছোট করে, মাতৃভাষাকে মলিনভাবে উপস্থাপন করে বিদেশী ভাষাকে গ্রহণ করার মতো অন্যায় আর হয় না। বাংলা ভাষার বিকৃতি এখন যে কেবল 'আধুনিকতার ভুল সংজ্ঞা জানা' তরুণ-তরুণীদের মধ্যেই দেখা যায়, তা নয়। বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির বিজ্ঞাপন, তথাকথিত নাট্যকার ও নাট্য পরিচালকের অসুস্থ মানসিকতার অসংলগ্ন বহিঃপ্রকাশেও বাংলা ভাষার বিকৃতি দেখা যায়।

স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে আওয়ামী লীগই ছিল সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সবাই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতেন। আবার সকাল ১০টায় লাখো জনতার সঙ্গে তিনি আসতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি যখন সরকার প্রধান হয়েছিলেন, তখনও ঠিক একইভাবে আসতেন। স্বাধীনতার আগে হাতেগোনা কয়েকটি সংবাদপত্র ছিল, আলোকচিত্র সাংবাদিকদের সংখ্যাও ছিল কম। জাতীয় প্রেস ক্লাবের টেবিল টেনিস রুমে সারারাত জেগে থাকতাম। প্রথম প্রহরে ছবি তুলে তা পরের দিনের সংবাদপত্রে ছাপাতাম। 'পাকিস্তান অবজারভার'-এ চাকরিকালীন ১৯৬১-৬৪ সাল পর্যন্ত আমার পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম মোজাম্মেল ভাই, বুলু ভাই এবং আমি— এ তিনজন মিলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছবি তুলতাম। যার ছবি ভালো হতো, শ্রদ্ধেয় মুসা ভাই (এবিএম মুসা) সে ছবি ছাপাতেন। তিনি ছিলেন সে সময় 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর সম্পাদক। 'মর্নিং নিউজ'-এর লাল ভাই, 'ইত্তেফাক'-এর মিজান ভাই (পরে আফতাব আহম্মেদ যোগ দেন), 'সংবাদ'-এর কামরুল (পরবর্তী সময়ে মতিন যোগ দেন); 'দৈনিক আজাদ'-এ বেতনভুক্ত স্থায়ী আলোকচিত্র সাংবাদিক ছিল না। ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে আমি 'দৈনিক আজাদ'-এ যোগ দেই। বর্তমানে ডিজিটালের যুগ, একজনের তোলা একটা ছবিই ১০-১৫ জনের নামে, ১০-১৫টা পত্রিকায় ছাপানো হয়, আমাদের প্রতিযোগিতা ছিল। পেশাগত দায়িত্ব পালনে একে অন্যকে সহযোগিতা করেছি, কিন্তু কখনই একজনের তোলা ছবি অন্যজন ব্যবহার করিনি।

বাংলা এমনই এক ভাষা, যার চিরসুধাময় বাণী আমাকে, আমাদের, প্রতিটি বাঙালিকে আবৃত করে রাখে এক অপার মহিমায়। এ ভাষার জন্য যারা বুকের রক্ত দিয়েছিল, আজ সময় এসেছে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার। এখনও মাতৃভাষার যথাযথ মর্যাদা আমরা দিতে পারিনি। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের যে স্বপ্ন এক সময় আমরা দেখেছি, আজ তা ম্রিয়মাণ প্রায়। তারপরও আবার স্বপ্ন বুনি। স্বপ্ন দেখি বাংলায় রক্তস্নাত বর্ণমালা আলোকোজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দ্যুতি ছড়াচ্ছে বাঙালির জীবনে।